ধন্য পানিহাটী

শ্রী অজিত কুমার ঘোষ, প্রাক্তন ছাত্র এবং শিক্ষক

দুদণ্ড বিশ্রাম করো হে শ্রান্ত পথিক, এই বটবৃক্ষ মূলে,
গৌরাঙ্গ পরশপূত এই সেই মহাতীর্থ সুরধুনী কূলে।
শ্রী গৌরাঙ্গ বাঙ্গালীর একমাত্র প্রাণমন্ত্র পরম বৈভব,
গঙ্গাতীরে পানিহাটী অতীতের সাক্ষ্যরূপে বাড়ায় গৌরব।

এই প্রাচীন জনপদের নাম পানিহাটী। প্রায় হাজার বছর আগে থেকেই এই জনপদের নাম বিভিন্ন পুঁথি ও গ্রন্থে উল্লেখ আছে। যেমন ঃ মনসা মঙ্গল (১৪৯৫) বিপ্রদাস পিপলাই, চৈতন্য মঙ্গল (১৫৪১) জয়ানন্দ, চৈতন্য ভাগবত (১৫৪২) বৃন্দাবন দাস, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (১৬১৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি।

সারা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় বড়ো বড়ো নদীর তীরেই যেমন প্রাচীন সভ্যতার পত্তন ঘটেছিল তেমনি গঙ্গা নদীর তীরে এই সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে — সেই নদীর ধারে মানুষের বসবাসের শাশ্বত ইচ্ছাকে কেন্দ্র করেই। এখন গ্রামের বা জনপদের নাম কেমন করে পানিহাটী হলো? মনে হয় প্রায় হাজার বছর আগেকার সংস্কৃত নাম 'পন্যহট্ট' বা 'পুণ্যহট্ট' নাম থেকেই পানিহাটী হয়েছে, যা শেষ পর্য্যন্ত 'পেনেটী' নামে এসে দাঁড়িয়েছে। পন্যহট্ট বা পুণ্যহট্ট হাজার বছর আগে হয়ত নাম ছিল কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতেই—প্রায় ছয়শো বছর আগে বিভিন্ন গ্রন্থে পানিহাটী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন কাল থেকেই এই জনপদ শুধু ধর্মচর্চা নয় ব্যবসা বানিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। বর্দ্ধমানের কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা এবং হুগলীর ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) ও মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত বা তমলুক থেকেও বড়ো বড়ো মহাজনী নৌকা ধান বা চাল বোঝাই করে পেনেটীর বাজার বা চাউলপট্টীর আমদানী ঘাটে এসে লাগতো। এই ঘাটের সিঁড়ির উচ্চতা মাত্র ৩/৪ ইঞ্চি — এত কম উচ্চতায় কোন ঘাট এতদঞ্চলে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। মুটে বা বাহকেরা দুমণ বা আড়াই মণের বস্তা নিয়ে সহজেই ওঠানামা করতো। চাউলপট্টীতে তখন বড়ো বড়ো ধান বা চালের গুদাম ছিল এবং ধানকলও ছিল। এখান থেকেই চাল ও ধান নদীপথে বা স্থলপথে যশোর, খুলনা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান যেত। যশোর জেলায় যে পেনেটী ধানের আবাদ হয়, তা এখান থেকেই সরবরাহ হত। যশোর থেকে আবার গোযানে স্থলপথে প্রচুর গুড় আমদানী হতো। কয়েকশো বছর আগেও গঙ্গায় সারি সারি নৌকা এবং রাস্তায় গরুর গাড়ীর সারি দেখা যেত।

গৌড়ের রাজা বল্লালসেনের সময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার কেন্দ্র ছিল। পরে শৈব উপাসক, তান্ত্রিক কাপালিক ও নাথপন্থী যোগীদের সাধনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পানিহাটী এবং খড়দহ বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের বেশ কিছু সাদৃশ্য ছিল। স্বাভাবিক কারণেই গঙ্গানদীর তীরে সব ধর্মের

সাধকদের আস্তানা গড়ে ওঠে। সেন বংশের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান ঘটে। বল্লাল সেন যেমন কুলীন ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহ করে খড়দহ, পানিহাটী, আড়িয়াদহ প্রভৃতি অঞ্চলে বসিয়েছিলেন তেমনি অন্য ব্রাহ্মণেরাও তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন নি। সেই রকম এক অকুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ধর্মপ্রাণ, ভগবৎপ্রেমী গঙ্গানারায়ন পণ্ডিত পানিহাটীতে নিজগৃহে শ্রীশ্রী মদনমোহন এবং রাধারানী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তাঁরই পৌত্র রাঘব পণ্ডিতের সময়ে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উক্ত বিগ্রহদ্বয়ের পূজা করেন। হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ সহজিয়া, তান্ত্রিক, কাপালিক, শৈব এবং নাথ যোগীদের সাধনার ক্ষেত্র পানিহাটী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যনন্দ মহাপ্রভুর আগমনের পর ধীরে ধীরে বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সাধনার পীঠস্থানরূপে গণ্য হয়। জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল কাব্যে (১৫৪২ খৃঃ) আছে —

পানিহাটী সমগ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে। বড় বড় সমাজ আর পতাকা মন্দিরে॥

শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে (১৫৪১খৃঃ) বৃন্দাবন দাস লিখেছেন —

কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে। কৃষ্ণ কার্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
তবে গেলা পানিহাটী রাঘব মন্দিরে॥ সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হৈলা বিদিত॥

চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে জয়ানন্দ আরো লিখেছেন —

আগে পানিহাটী আর আকনা মহেশ। পুণ্যভূমি সপ্তগ্রাম ধন্য রায় দেশ॥

অনেকে যে মনে করেন এই পুণ্যভূমি পানিহাটী, পন্যহট্ট বা পুণ্যহট্ট থেকে নামকরণ, তা ওই ষোড়শ শতাব্দীর নয় আরো পাঁচশো থেকে হাজার বছর আগেকার। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গঙ্গার উপকূলে যে সব জনপদের নাম পাওয়া যায় গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর অবধি সেগুলি হল—উত্তরকাশী, দেবপ্রয়াগ, হৃষিকেশ, হরিদ্বার, প্রয়াগ বা এলাহাবাদ, কাশী বা বারাণসী, পাটলীপুত্র বা পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজমহল, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা, শান্তিপুর, কুমারহট্ট বা হালিশহর, ত্রিবেণী, চুঁচুড়া বা হুগলী, ফরাসডাঙা বা চন্দননগর, শ্যামনগর, খড়দহ, পানিহাটী, দক্ষিণেশ্বর, বরাহনগর, চিৎপুর, কালীঘাট, বোড়াল, বহড়ু বা জয়নগর এবং ছত্রভোগ প্রভৃতি। কালীঘাট এবং শেষের কয়েকটি স্থান আদিগঙ্গার তীরে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পানিহাটী আসেন দুবার। প্রথমবার নবদ্বীপ থেকে পুরী বা নীলাচল যাওয়ার পথে এবং দ্বিতীয়বার নীলাচল থেকে বৃন্দাবনের পথে গৌড় আসবার সময় পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-মধ্যলীলায় বর্ণনা আছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৬১৫ খৃঃ) —

সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী। রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লৈঞা গেলা।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপাশাটী॥ পথে বড় লোকভীড় কষ্টে সৃষ্টে আইলা॥
প্রভু আইলা করি লোকে হৈল কোলাহল। একদিন তাহা মাত্র করিলা নিবাস।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল।। প্রাতে কুমারহট্ট আইলা যাহা শ্রীনিবাস।।

(কুমারহট্ট —বর্তমান হালিশহর)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আরো রয়েছে —

শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ নর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে আর রাঘব ভবনে,
এই চারিঠাই প্রভুর সদা আবির্ভাব।।

(১) শচীর মন্দির — নবদ্বীপ, (২) নিত্যানন্দ নর্তন — নবদ্বীপ, (৩) শ্রীবাস অঙ্গন — শান্তিপুর, (৪) রাঘব ভবন — পানিহাটী)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পানিহাটী আগমনের বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে সবিস্তারে বলা আছে।

প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটী গঙ্গাতীরে মহোৎসবতলায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর "দণ্ড মহোৎসব" মেলা বসে, তেমনি কার্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে মহাপ্রভুর আগমনী "স্মরণ মহোৎসব" মেলাও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যেমন রঘুনাথের দণ্ড মহোৎসব বা চিঁড়া দধি মহোৎসবের কথা বলা হয়েছে তেমনি নীলাচলে রাঘবের ঝালি বা রাঘবঘরনী শ্রীমতি দময়ন্তী দেবীর প্রেরিত রাঘব পণ্ডিতের ঝালির কথাও বলা হয়েছে।

রঘুনাথের পিতার নাম ছিল গোবর্দ্ধন দাস। তিনি ছিলেন হুগলীর সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরের জমিদার। এঁদের উপাধি ছিল মজুমদার।

রঘুনাথ অল্প বয়স থেকেই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নামকীর্তন এবং বৈষ্ণবধর্মের সহজ মাহাত্ম্য বিশেষভাবে রঘুনাথকে আকর্ষণ করে। তিনি অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করে পরমার্থ লাভের ইচ্ছায় দীক্ষালাভের জন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বা নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর খোঁজে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে থাকেন। অবশেষে পানিহাটী গ্রামে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পান এবং তাঁর নাম সংকীর্তনে মুগ্ধ হন। পানিহাটী গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তাঁকে দীক্ষাদানের পরিবর্তে দন্ডদান করেন। অল্পবয়সে পিতামাতা ও নববিবাহিতা স্ত্রীকে এবং সংসার ছেড়ে আসার জন্য। সে দন্ড ছিল সমবেত ভক্তমন্ডলীকে চিঁড়া দধি মিষ্টান্ন সহযোগে ফলার বা ফলাহার বিতরণ। সেই দিনটি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ১৪৩৯ শকাব্দ অর্থাৎ ৯২৬ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী জুন, ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ। সেই থেকে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই দন্ড মহোৎসব বা চিঁড়া দধির ফলার মহোৎসব পানিহাটী গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে মহোৎসবতলায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ —

"তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে। তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে।। দেখি প্রভুর রঘুনাথ বিস্মিত।।
পানিহাটী গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন। দন্ডবৎ হঞা পড়িল কত দূরে।
কীর্তনিয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন।। সেবক কহে— "রঘুনাথ দন্ডবৎ করে"।।
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিন্ডির উপরে। শুনি প্রভু কহে—"চোরা দিলি দরশন।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে।। আয় আয় আজি তোর করিব দন্ডন'৪।।

● ● ● ● ●

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়। সেইক্ষনে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।। ভক্ষদ্রব্য লোকসব গ্রাম হইতে আনে।।
নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে। চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
আজি লাগি পাইয়াছি দান্ডিব তোমারে।। সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা।।
দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে। মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ-মনে।। আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন।।

● ● ● ● ●

তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন। প্রভু বিশ্রাম কৈল দিল অবশেষে হৈল।
জলে নামি দধিচিঁড়া করায়ে ভক্ষণ।। রাঘব মন্দিরে তবে কীর্তন আরম্ভিল।।
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার। ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
চিঁড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার।। শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়।।

● ● ● ● ●

রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার। মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার।।

রঘুনাথ মজুমদার দীক্ষালাভের পর দাস রঘুনাথ বা শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী রূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর সমাধি আছে। বৃন্দাবন যাত্রার সময় তাঁদের পারিবারিক গৃহদেবতা সপ্তগ্রামের শ্রীশ্রী রাধারমন জিউ বিগ্রহটী নিত্যসেবার জন্য শ্রীরাঘব পন্ডিতের পাঠবাড়িতে রেখে যান। আজও রাঘবের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূজিত শ্রীশ্রী মদন মোহনের সাথে রাধারমন জিউও পূজিত হন।

শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত— অন্তলীলা, রাঘবের ঝালি

রাঘব পন্ডিত চলে ঝারি সাজাইয়া। নানা অপূর্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুযোগ্য ভোগ।
দয়মন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া।। বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপভোগ।।
আম্রকাসন্দী আদা ঝাল কাসন্দী নাম।
লেম্বু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান।।

● ● ● ● ●

কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস। শালিধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।। চিনি পাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।।

● ● ● ● ●

সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার। ঝালির উপর মুনসিব মকরধ্বজ কর।
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার। প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর।।

শ্রী রাঘব পন্ডিতের যে আদ্য অনুচর মকরধ্বজ করের (মুনসিব) নাম পাওয়া যায় তাঁর বাড়ী ছিল পানিহাটী ঘোষপাড়া মনসাতলায়। তাঁর সঙ্গে পুরন্দর মিশ্র নামে পানিহাটীর আর এক গ্রামবাসীর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে 'দন্ড মহোৎসব' সংগঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন, যা শ্রীচৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যায়।

পাঁচশো বছরেরও অধিককাল আগে পানিহাটীর যে ঘাটে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন সে ঘাট প্রায় হাজার বছর আগেকার বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু কে সেই ঘাট তৈরী করেছিলেন তা জানা যায় না। পরবর্তীকালে যাকে শ্রীচৈতন্য ঘাট বলে অভিহিত করা হয়েছে—সে ঘাট আজ আর নেই। সেটি এবং পানিহাটী শ্মশানের দক্ষিণে মিত্রপাড়ার চাঁদ দালালের ঘাট ১৯০৫ খৃঃ

ভূমিকম্পে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে ঐ দুটি ঘাটের ছোট বড়ো ভাঙা টুকরোগুলো গঙ্গাবক্ষে তীরের নিকট দেখা যেত—যা প্রবীণ মানুষেরা এখনো স্মরণ করতে পারেন। সেই প্রাচীন শ্রীচৈতন্য ঘাট আজ আর নেই বটে কিন্তু অক্ষয় বটবৃক্ষ (যার তলায় শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তন করেছিলেন) এবং মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত বেদী আজও বর্তমান। CMDA (যা এখন KMDA) সেই প্রাচীন ঘাটের জায়গায় একটি ঘাট বানিয়ে দিয়েছেন।

কয়েকশো বছর আগেই বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ পানিহাটীর পরিচিতি ঘটেছিল। বৈষ্ণবদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই তীর্থস্থানটির স্মৃতি রক্ষার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঞ্চলে আটলান্টা নামক স্থানের নামকরণ করা হয়েছে—"নিউ পানিহাটী"। আমেরিকার ইস্‌কন-এর ভক্তিবেদান্ত ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান শ্রী জয়পতাকা স্বামীর চিঠিতে জানা যায়— "Iscon's temple in Atlanta, Georgia, U.S.A., has been declared that Atlanta shall henceforth be called "New Panihati."

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পানিহাটীতে অবতরণের সেই প্রাচীন ঘাটের দুখানি ইট আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরের উইনটার পার্কে (WALK OF FAME) স্মারক স্তম্ভে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত ঘাটের চিহ্ন হিসাবে সযত্নে রক্ষিত আছে (বাংলার তীর্থ— ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য)।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যে ঘাটের মতই তাঁর একান্ত পার্ষদভক্ত রাঘব পণ্ডিতের গৃহ এবং তাঁর পিতামহ গঙ্গানারায়ণ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী মদনমোহনের মন্দির—সবই আজ কালের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত, সেই রাঘব ভবন বা পাঠবাড়ী সম্পূর্ণ নূতনভাবে তৈরী করা হয়েছে। নূতন ভবনে রয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূজিত শ্রীশ্রী মদনমোহন ও রাধারাণী, আর রয়েছেন শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রী রাধারমন জিউ ও রাধারানী। রাঘবের ঝালি ও আরো কিছু নিদর্শন এখানে রাখা আছে, আর আছে রাঘব পন্ডিতের সমাধি মাধবীকুঞ্জ। পশ্চিমদিকে কিছুটা দূরে রয়েছে একটি দোল মঞ্চ মন্দির যেখানে পঞ্চমদোল অনুষ্ঠিত হত।

মহাপ্রভুর পানিহাটী আগমনের প্রায় সাড়ে তিনশো বছর বাদে বেশ কয়েকবার এখানে এসেছেন বাংলার আর এক অবতার পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। গঙ্গাতীরে পানিহাটীর মহোৎসবতলায় প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর যে 'দন্ড মহোৎসব' বা চিঁড়া দধির উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার আয়োজন করতেন পানিহাটির ধর্মপ্রাণ সেন পরিবার এবং জমিদার রায় চৌধুরীরা। সেন পরিবারের পূর্বপুরুষ গুরুচরণ সেন তাঁর গুরুর আদেশক্রমে পানিহাটী দন্ড মহোৎসব তলার পাশেই গঙ্গাস্নানের ঘাট (শ্রী গৌরাঙ্গ ঘাট) এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবালয়ে রয়েছে— গৌর নিতাই, রাধাকৃষ্ণ এবং রেবতী বলরামের বিগ্রহ। একটি ফলকে লেখা — ওঁ অমৃততীর্থ — সব ধর্মে এক ভগবান এবং সামনের একটি ঘরের ফলকে লেখা — এই ঘরে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিশ্রাম করেছিলেন। এই গৃহে মহোৎসবের দিনে বিরাট কীর্তনের আসর বসে। গুরুচরণ সেনের পৌত্র শ্রী মনিমাধব সেন প্রতি বছরই পরমহংসদেবকে ভক্তিনম্র আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোড়ায় টানা জুড়ী গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন —"ওরে পেনেটিতে হরিনামের মেলা বসেছে। চল্ যাই- দেখে আসি।" কোনও বার দশ/বারোজন শিষ্যসমেত (যাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি অর্থাৎ পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দও ছিলেন) পেনেটির হরিনামের মেলায় আসতেন ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। কখনও ঠাকুরের সঙ্গে আসতেন শ্রী বলরাম বসু (যাঁর বাড়ীতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়)। নাট্যকার শ্রী গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রী রামচন্দ্র দত্ত, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় এবং মহিলাদের মধ্যে যোগীন মা ও গোলাপ মা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মনে হয় প্রথমবার এই পানিহাটীর হরিনামের মেলায় এসেছিলেন ১৮৫৮ সালের ২৫শে জুন, বাংলা ১১ই আষাঢ়, ১২৬৫ সাল সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। মেলায় এসে তিনি শ্রী মনিমাধব সেনের গুরুদেব নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামীর কীর্তনের দলে

ঢুকে পড়লেন। কীর্তনের দলের সঙ্গে ঠাকুর পরমানন্দে নাচছেন এবং মাঝেমাঝেই সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। পরক্ষণেই উঠে আবার নামগান করছেন—"যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা দু-ভাই এসেছে রে— যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায় তারা দু-ভাই এসেছে রে।" ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি নাচছেন, আর সব ভক্তরা গোস্বামীজীকে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তিনি তখন অর্ধবাহ্যদশা অবস্থায়, কখনও সিংহবিক্রমে নৃত্য করছেন, আবার কখনও সংজ্ঞা হারিয়ে স্থির হয়ে যেন সুখময় সাগরে মহানন্দে সাঁতার কাটছেন (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ)।

পানিহাটীর এই মহোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি ভক্তদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করত। "ঠাকুর সংকীর্তনানন্দে—ঠাকুর কি গৌরাঙ্গ?

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব ক্ষেত্রে বহুলোক সমাকীর্ণ রাজপথে সংকীর্তনের দলের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। বেলা হইয়াছে। আজ সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি, ১৮ই জুন, ১৮৮৩। সংকীর্ত্তন মধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, কেহ কেহ ভাবিতেছে, শ্রী গৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন? চতুর্দিকে হরিধবনি সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় বাড়িতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও হরির লুট পড়িতেছে।

শ্রী নবদ্বীপ গোস্বামী এবং কীর্ত্তনের দল সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রাঘব মন্দিরাভিমুখে যাইতে ছিলেন। এমন সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কোথা হইতে তীর বেগে আসিয়া সংকীর্ত্তন দলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—'নদে টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলেরে'। ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন আর বোধ করিতেছেন, গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন। পেনেটীর মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারী ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রী গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই-একজন ভাবিতেছে ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই গৌরাঙ্গ। ক্ষুদ্র আঙিনায় বহুলোক একত্রিত হইয়াছে। ভক্তেরা অতি সন্তর্পনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বাহিরে আনিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীমনি সেনের বৈঠকখানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। এই সেন পরিবারদেরই পেনেটিতে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের সেবা। তাঁহারই এখন বর্ষে বর্ষে মহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন ও ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করেন। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-ষষ্ঠখন্ড-শ্রীম)।

পানিহাটী যেমন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, মহাসাধক শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও সন্ন্যাসী পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলিধন্য হয়েছিল, তেমনি আর এক মহামানব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিও বিজড়িত। Govt.of Bengal এর Administrative Report- এ দেখা যায় "The very peculiar fever of disease known as dengu commenced to attract Calcutta people towards the end of 1871. কলকাতায় সেবার মারাত্মক ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল সেই ১৮৭১-৭২ সালে, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে প্রথমবার পানিহাটী আসেন। সেবার তিনি প্রায় দু-মাস এখানে ছিলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১০ বৎসর। রবীন্দ্রনাথ "জীবন স্মৃতি" তে লিখেছেন—"একবার কলিকাতায় ডেঙ্গু জ্বরের তাড়নায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম। এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরের সামনে গোটাকয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মত পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কি অপূর্ব খবর পাওয়া

যাইবে। পাছে একটুও লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণ শোনিতপ্লাবন। এক একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে। ওপারের গাছগুলি কালো। নদীর উপর কালোছায়া দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে।'' কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঘিঞ্জি পরিবেশ ও কোলাহল ছেড়ে পানিহাটীর গঙ্গাতীরের নির্জন মনোরম প্রকৃতি নিশ্চয়ই কবির বালক মনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং কবিত্বের প্রেরণা জুগিয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনে পানিহাটীর গঙ্গাতীরের প্রভাব এতটাই ছিল যে কবির ৭৬ বছর বয়সে ১৯৩৭সালে চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানে (গঙ্গাতীরে যেটি আজ 'রবীন্দ্র মানস') তিনি স্বীকার করেছিলেন যে পেনেটীর বাগানেই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তাঁর সঞ্চরণ ও স্বাধীন বিহার তাঁর চিত্তের যথার্থ উন্মেষ ঘটিয়েছিল। দ্বিতীয়বার কবি পানিহাটী আসেন ১৯১৯ সালে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরাজ জেনারেল ডায়ারের নৃশংস হত্যাকান্ডে ব্যথিত হৃদয়ে মানসিক শান্তির সন্ধানে তিনি সেই পেনেটির বাগান বাড়ীতে আসেন। কিন্তু গঙ্গাতীরের এই নির্জন প্রকৃতিও তাঁর মনকে শান্ত করতে পারেনি। পরাধীনতার জ্বালা বুকে নিয়ে সারারাত জেগে ছট্‌ফট্ করে পরের দিনই জোড়াসাঁকো ফিরে যান। ইংরাজ গভর্ণমেন্টের দেওয়া 'নাইট হুড' খেতাব বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়লাটকে চিঠি পাঠিয়ে দেন (মে, ১৯৯৯)। রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার পেনেটীর বাগানে আসেন ১৯৩৩ সালে। কিন্তু সেই ছাতুবাবুর বাগান তখন হয়ে গিয়েছে— গোবিন্দ কুমার হোম, অনাথা ব্রাহ্ম বালিকাদের একটি আশ্রম। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় জে.পি.মিত্র মহাশয় ছিলেন এই আশ্রমের অবৈতনিক সম্পাদক। সেবারে কবি এখানে এসেছিলেন এক আশ্রমকন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন বড়োদিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানী। শেষবার রবীন্দ্রনাথ পানিহাটী আসেন ১৯৩৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহধর্মিনী বাসন্তীদেবীর নামে পানিহাটীতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর বাসন্তী কটন মিলের (বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর বিপরীতে) উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ছাড়াও ছিলেন বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের ইংরাজ ইন্ডাস্ট্রীয়াল ডিরেকটর এ. টি. ওয়ান, ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (কালাজ্বরের ঔষধের আবিষ্কর্তা), প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রী বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী সুরেন্দ্র নাথ লাহা, কলকাতার মেয়র শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী সত্যেন মজুমদার ও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী প্রফুল্ল কুমার সরকার প্রমুখ।

পানিহাটীতে যেমন রয়েছেন চৈতন্য মহাপ্রভু পূজিত রাঘব পন্ডিতের শ্রীশ্রী মদনমোহন ও শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রী শ্রী রাধারমন জিউ-রাঘব ভবন বা পাঠবাড়ী, তেমনি জমিদার রায় চৌধুরীদের শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দজী অবস্থান করছেন পানিহাটী বাজার সংলগ্ন কাছারী বাড়ীর দোতলায়। "এই রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন লর্ড ক্লাইভের সময় এই জমিদারদের আদিপুরুষ নাটোরের রানী ভবানীর দেওয়ান শ্রী গৌরীচরণ রায় চৌধুরী। দেওয়ান গৌরীচরণের পানিহাটী-দুর্গাপুর জমিদারী তৎকালে কিরূপ বিশাল ছিল তাহার একটি ইঙ্গিত সরকারী গেজেটে পাওয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ সাল) পরে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের পরেই পানিহাটীর বাবুরা সর্বাপেক্ষা বেশি রাজস্ব দিতেন। তাঁহার পুত্র জয়গোপাল রায় চৌধুরী কাশীতে গিয়ে বহু দান-ধ্যান করেন ও সাধু-সন্ন্যাসী ভোজন করান। দেশে ফিরিয়া তিনি বহু দান, মন্দির প্রতিষ্ঠা, রাস্তা, ঘাট প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মোত্তর দান, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন।'' (শনিবারের চিঠি, আষাঢ়, ১৩৫৬)

দেওয়ান গৌরীচরণ শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেও মন্দির তৈরী করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রী জয়গোপাল রায় চৌধুরী। তিনি শ্রীশ্রী

রাধা গোবিন্দজীর মন্দির ছাড়াও তৈরী করেছিলেন সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী, সদাশিব মন্দির, সপ্তখিলানের ত্রিস্তর অপূর্ব দুর্গাদালান ও নাটমন্ডপ, যেগুলি ছিল বর্তমান উত্তরায়নের বরুন স্পোর্টিং সংলগ্ন এলাকায়, যা আজ একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু টিকে আছে তাঁর তৈরী রাস্তা, সদাশিব মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী, বাজারের স্নানের ঘাট, রাধাগোবিন্দজীর রাসমঞ্চ ও চারটি আটচালা শিব মন্দির। কিন্তু পানিহাটী বাজারের স্নানের ঘাট সংলগ্ন পোস্তা এবং দুপাশের দোতলা নহবতখানা গঙ্গাগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পানিহাটী জমিদার বাবুদের বসতবাড়ী বর্তমান ইলেকট্রীক পাওয়ার হাউসের বিপরীতে উত্তরায়ন সংলগ্ন অঞ্চলে, কালীপুকুর পাড়, বাজার প্রভৃতি জায়গায় সারা বছরই কোন না কোন উৎসব লেগেই থাকত। দুর্গোৎসব, কালীপূজা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী প্রভৃতি উৎসবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাঁকজমক ছিল রাস উৎসব। পানিহাটী বাজারে রাধাগোবিন্দজীর রাসমঞ্চের চারপাশে পুতুল নাচ, মেলা, দোকানপাট, আলো,বাজী, বাজনা ও রোশনাই ছিল দেখবার মত। বাবুদের রাস বিখ্যাত, খুব ধুমধাম। লোকে বলত (এখনও বলে)—

"রাস তাস জোরের লাঠি। তিন নিয়ে পানিহাটী"।।

(শনিবারের চিঠি—আষাঢ়,১৩৫৬)

পানিহাটি পৌরাঞ্চলে সোদপুর ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যে সরকারী আবাসন (Govt. Housing Estates) রয়েছে সেই জায়গায় আজ থেকে ৫০ বছর আগে ছিল শ্রী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত "খাদি প্রতিষ্ঠান"। ১৯২৭ সালের ২রা জানুয়ারী জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পানিহাটী পৌরঞ্চলে এই খাদি আশ্রম উদ্বোধন করেন। গান্ধীজীর কাছে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান ছিল দ্বিতীয় মাতৃভূমি। গান্ধীজী এই খাদি প্রতিষ্ঠানে এসে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটাতেন। পাঁচবার তিনি এই আশ্রমে এসেছেন (১৯২৭, ১৯৩৯, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭ সালে)। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গেই আবর্তিত হত। সোমবার থাকত গান্ধীজীর মৌন দিবস। কাজেই সোমবার বাদে অন্যান্য দিন এই খাদি প্রতিষ্ঠানে এসেছেন ভারতের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা যেমন শরৎচন্দ্র বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফর খান, শহীদ সুরাবর্দী, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিত, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯৩৯ সালে এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী রহড়ার বিখ্যাত ব্যারিস্টার কবি শ্রী সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় গান্ধীজীকে নিকটবর্তী পানিহাটী তীর্থ সম্বন্ধে অবহিত করান এবং একটি কবিতা লিখে তার ইংরাজী অনুবাদ করে শোনান। গান্ধীজীও তীর্থদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কবিতাটি হল —

"সোদপুরে এসে একদিনও তুমি এলে নাকো পানিহাটী
আমার প্রভুর পায়ের পরশে সোনা হল যার মাটি।
হেথায় রাঘব ভবনে নিত্য প্রভুর আবির্ভাব
এত কাছে এসে সেথা কি যাবে না? এ বড় মনস্তাপ।
সুদীর্ঘকাল পথ চেয়ে আছে সে কিগো আসিবে ফিরে,
অতীতের স্মৃতি মনে করি ভাসে, পানিহাটী আঁখিনীরে।
সে মোহন তনু, আলুথালু বেশ, নয়নে আবেশ আঁকা
মাধবীকুঞ্জ প্রহর গুনিছে, কবে সে উদিবে রাকা?
মনের পরশে ভোলে না মাধবী, চায় সে পাগল চাঁদে,
নিত্য নিতুই আসে আর যায়, প্রাণ তাই কারো কাঁদে,
গোটা সে মানুষ সুঠাম সুতনু দেবে না আলিঙ্গন?
ঘন সুনিবিড় পাতাগুলি কাঁপে রহি রহি অনুক্ষণ।
অদূরে পতিত পাবনী গঙ্গা বয়ে যায় ধীরে ধীরে,
এই বাঁধাঘাট, এই সেই বট, দাঁড়ায়ে নদীর তীরে।
রাজার কুমারে বাঁধিতে নারিল, রমনী রাজ্যসুখ
দড়ির বাঁধনে বাঁধিতে চাহিল, স্নেহাতুর মার বুক।
ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সম জায়া,
এ সব ফেলিয়া রঘুনাথ শুধু চাহিল-চরণ ছায়া।

বাপুজী, বাপুজী, আমাদের এই একান্ত নিবেদন,
ক্ষণতরে তুমি পানিহাটী যেয়ো জুড়াইতে তনু মন।
দেখিও কাঙাল দরিদ্র এক ভক্ত নিভৃত কোণে
প্রভুর পাদুকা বুকে করি নাম জপিতেছে মনে মনে।
কুড়ায়ে রেখেছে পরম যতনে ছিন্ন কন্থাখানি,
সন্ন্যাসী বেশে শ্রী অঙ্গে যাহা গোরা নিয়েছিল টানি,
এর পথ ঘাট, প্রতি ধূলিকণা, মুক্তোর চেয়ে দামী
এই ধূলোতেই আমার প্রাণের দেবতা এলেন নামি।
সোদপুর হতে বেশী দূরে নয়—এই পথ গেছে গাঁয়ে
একদিন তুমি অতি প্রত্যুষে দাঁড়াইয়া বটছায়ে,
বাঙালীর এই পরম তীর্থে ভরা গঙ্গার কূলে
বাঙালীর প্রাণ-শতদলটিরে যতনে লইও তুলে।
তুমি ভারতের মহান আত্মা, শক্তির মূলাধার,
অকপটে তাই করিনু জ্ঞাপন যাহা ছিল বলিবার।
তোমারে স্মরণ করানু বলিয়া আমারে করিও; ক্ষমা,
করিও পরশ মাধবীকুঞ্জ, বটেরে পরিক্রমা।"

গান্ধীজী পানিহাটী তীর্থ দর্শন করবেন শুনে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। সোদপুরের খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে পানিহাটী গঙ্গার ঘাট পদব্রজে মাত্র ২৫ মিনিটের পথ। পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর তৎকালীন চেয়ারম্যান শ্রী সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ দু-দিন অহোরাত্র লোকজন খাটিয়ে গান্ধীজীর গমনপথ সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করে দেন। রাঘব পন্ডিতের রক্ষিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবহৃত কাঁথা, পাদুকা (খড়ম), জপের মালা, তালপাতার পুঁথি, মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর প্রভৃতির সংরক্ষণ যিনি করেছিলেন, রাঘবের উত্তরসূরী হিসাবে সেই শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, সুপন্ডিত প্রবীণ ভক্ত শ্রীশ্রী অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় গান্ধীজীকে দেখাবার জন্য এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ১৮ই জানুয়ারী ১৯৪৬ সাল, শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় মহাত্মাজী খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীমতী আভাগান্ধী, শ্রীমতী মনিবেন প্যাটেল ও অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে পদব্রজে পানিহাটী বটতলায় আগমন করেন। অনেকেই তখন নিজ নিজ মোটর গাড়ীতে গান্ধীজীকে পৌঁছে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের নিরুৎসাহ করে বলেন—"তীর্থ পরিক্রমায় পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো"। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দন্ড মহোৎসবতলায় উপস্থিত ছিলেন রায় বাহুদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পন্ডিত অমূল্যধন রায়ভট্ট, পানিহাটী ত্রাননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যালয়ের সম্পাদক, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র (পরবর্তীকালে শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা) (এঁরা দুজনেই পরে এলাকার বিধায়ক হয়েছিলেন), পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রী সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি। গান্ধীজী বটবৃক্ষ পরিক্রমার পর প্রায় ২০ মিনিট দন্ডায়মান অবস্থায় প্রদর্শনীর জিনিসগুলো দর্শন করেন ও সে সম্বন্ধে সকল তথ্য শ্রবণ করেন। পরে যখন তাঁর হাতে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত ছিন্ন কাঁথা, পুঁথি ও খড়ম ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়। তখন তিনি সন্তর্পনে সেগুলিতে হাত বুলোতে থাকেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুপাত হতে থাকে। সেদিন পানিহাটী ত্রাননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে (বিদায়ী ছাত্রদলের মধ্যে লেখকও একজন) গান্ধীজীর গমনাগমনের পথ নিয়ন্ত্রন করেছিলেন (আগের সারারাত্রি রাস্তা ঝাঁট দেওয়া এবং তোরণ সজ্জা সমেত)। তাঁকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য এই দেড় মাইল পথে বহু তোরণ পত্রপুষ্পে সাজানো হয়েছিল। পথপার্শ্বে গৃহের অধিবাসীবৃন্দ নিজ নিজ গৃহ পুষ্প পতাকায় সজ্জিত করেছিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে নরনারী, বালকবালিকা, নীরবে গান্ধীজীকে দর্শন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। মৃত্যুর দু-বছর আগে প্রায় ৭৭ বছর বয়সে গান্ধীজী সারা রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করবার পর তীর্থক্ষেত্রে উপবেশন পর্যন্ত করেননি। তিনি পুনরায় পদব্রজেই সোদপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। শ্রী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে থেকে তীর্থ পরিক্রমা শেষ করেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীরাঘব পন্ডিতের সংরক্ষিত শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবহৃত অমূল্য নিদর্শনগুলি তাঁর উত্তরসূরী শ্রী অমূল্যধন রায়ভট্ট তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে রক্ষা করে আসছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি এগুলি বৈষ্ণব স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতিকে দান করেন এবং শেষ পর্যন্ত

বিদ্যালয়ের তৎকালীন সম্পাদক শ্রী প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পানিহাটী ত্রাননাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের হলঘরে লাইব্রেরীর আলমারীতে সযত্নে রক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলি অজ্ঞাত কারনে বরানগর পাঠবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

এবার আসি পানিহাটীর ধর্মপ্রাণ, দাতা এবং মহানুভব সুসন্তান শ্রী ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। মধ্যযুগে প্রায় একশো বছর আগে ত্রাণবাবুই ছিলেন পানিহাটীর প্রকৃত রূপকার। ত্রাণবাবু বা তানুবাবুর কথা বলার আগে কিছু পূর্ব ইতিহাস জানা দরকার। মূলতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পানিহাটী আসার ফলে কয়েকশো বছর আগেই বৈষ্ণব মহাতীর্থ হিসাবে পানিহাটীর পরিচিতি ঘটেছিল। পানিহাটী বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান হলেও শাক্তদেরও প্রভাব কম ছিল না। দেগঙ্গা, বেড়াচাঁপার (বসিরহাট মহকুমা) প্রবল পরাক্রান্ত রাজা চন্দ্রকেতু পানিহাটীতে গঙ্গার নিকট গড় বা দুর্গ তৈরী করেছিলেন। দেগঙ্গা ও বেড়াচাঁপা পানিহাটী থেকে সোজা পূর্বদিকে প্রায় ৪০ মাইল। চন্দ্রকেতু রাজার গড়— ভবানীদেবীর গড় বা গড় ভবানী নামে বর্তমান পানিহাটী ত্রাণনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের উত্তরে গোবিন্দ কুমার হোমের কাছাকাছি ছিল। এই গড়ের ভিতরে রাজা চন্দ্রকেতু তাঁর আরাধ্যা দেবী ভবানী নামে এক কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী ভবানীর নামে সুখচর এবং পানিহাটী ওয়ার্ডের মধ্যে পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর ভবানীপুর নামে একটি ওয়ার্ড আছে। রাজা চন্দ্রকেতু বেড়াচাঁপা থেকে পানিহাটীর গঙ্গা পর্যন্ত গড় বা খাল কাটিয়েছিলেন। সেই খাল ভবানীদেবীর মন্দিরকে বেষ্টন করে গঙ্গায় পড়ত। এছাড়া রাজা চন্দ্রকেতু বেড়াচাঁপা থেকে পানিহাটী পর্যন্ত রাস্তাও তৈরী করেছিলেন। ফলে নৌকাযোগে শুধু জলপথেই নয় স্থলপথেও পালকী, গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীতেও পানিহাটী আসা যেত। সেই খাল বা নদীর মজে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ আজও কিছুটা দেখা যায় পানিহাটীর গোবিন্দ কুমার হোমের নিকট পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোডের ধারে রায়েদের ঝিল-এর মধ্যে। বর্তমান সোদপুর ষ্টেশন রোড, বারাসাত রোড, ঘোলা, মুড়াগাছা, তেঘরিয়া এবং সাজিরহাট-মধ্যমগ্রাম অঞ্চলে সেই নদী বা খালের কিছু অংশ আজও দেখা যায়। মতান্তরে তান্ত্রিক সাধকদের প্রবাদ এই যে "ভবানীদেবী বা তাঁরাময়ী কালী মূর্তি বেড়াচাঁপা-দেগঙ্গার চন্দ্রকেতু রাজার বাড়ীতে ছিল। মুসলমানেরা যখন তাঁর রাজত্ব ধ্বংস করে, তখন জনৈক ব্রহ্মচারী এই মূর্তি লইয়া গোপনে পলায়ন করেন ও গঙ্গাতীরে উপযুক্ত কমলাসনের উপর পঞ্চমুন্ডির আসন স্থাপন করিয়া মায়ের মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মচারীর শিষ্য পরম্পরা এই মূর্তির পূজা চলিয়া আসিতেছিল। পরে শেষ ব্রহ্মচারী তানুবাবুর পিতা শ্রী নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূজার ভার দিয়া পরলোক গমন করেন। তানুবাবুও মায়ের পূজা যথাশাস্ত্র করিয়া গিয়াছেন।"

(শনিবারের চিঠি— আষাঢ়, ১৩৫৬)

রাজা চন্দ্রকেতুর ভবানী দেবীর পুরানো মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে ত্রাণবাবু বা তানুবাবু বর্তমান গোবিন্দ কুমার হোমের ঠিক উত্তরে-সুন্দর এবং প্রকান্ড পঞ্চরত্ন কালী মন্দির (মতান্তরে তারা বা ভবানী মায়ের মন্দির), গঙ্গার ঘাট এবং তিনটি আটচালা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের মন্দির সংলগ্ন স্থানে পুরানো মন্দিরের পঞ্চমুন্ডির আসন (তান্ত্রিক ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত) পুনঃস্থাপন করা হয়। মায়ের জবা এবং গোলাপ ফুলের বাগান ছিল কিছুটা উত্তর দিকে ত্রাণবাবুর প্রশস্ত স্নানের ঘাট সংলগ্ন এলাকায়। পরবর্তীকালে সুন্দর লোহার রেলিং ঘেরা মায়ের জবা এবং গোলাপ বাগানের জমিতে তৈরী হয় সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস্-এর Director's Bunglow-VADANI HOUSE, যেখানে এখন ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের 'সৎসঙ্গ আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম জীবনে ত্রাণবাবু খুবই দুঃখ কষ্টে কাটিয়েছেন। তাঁর নয় বছর বয়সে পিতা নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি ভবানী মায়ের পূজারী ছিলেন) প্রয়াত হন। ভবানী দেবীর পূজা এবং সংসারের দায়িত্ব বালক ত্রাণনাথের ওপরেই পড়ে। বাধ্য হয়ে প্রথমে একটি চিনির আড়তে এবং পরে কাশীপুরে একটি জুট প্রেসে কাজ করতে থাকেন। বেশ কিছুদিন পরে তিনি কেরাণীর চাকরি পান র‍্যালী ব্রাদার্স-এর এক সহযোগী সংস্থায়।

ক্রমে তিনি সেখানে Head Clerk বা বড়বাবু হন। (Rally Brothers) র‍্যালী ব্রাদাস তখন ছাতার শিক ও পাটের গাঁট বাঁধার কাজ করত। তাঁর উপার্জন কিছু বাড়ে এবং সংসার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত র‍্যালী ব্রাদার্স এর Anderson সাহেবের পরামর্শে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে জুট কন্ট্রাক্ট নিতে থাকেন। তাতেই ত্রাণবাবুর ভাগ্য ফিরে যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বড় লোকদের মত পয়সা জমিয়ে বা বদখেয়ালে পয়সা নষ্ট না করে তিনি জনহিতকর কাজে জীবন উৎসর্গ করেন।

শুধু স্নানের ঘাট বা মন্দির তৈরী নয় গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার জন্য এলাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন একশো বছরেরও অধিককাল আগে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ) সেই সময় এই বিদ্যালয়ের এমনই সুনাম হয়েছিল যে শুধু পানিহাটী নয়, খড়দহ, সুখচর, আগরপাড়া, তারাপুকুর, উষুমপুর ও কামারহাটী প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও ছাত্ররা অধিকাংশই পায়ে হেঁটে এখানে পড়তে আসত। এমনকি খড়দহ অঞ্চলে তখন হাইস্কুল ছিল না সেজন্য প্রচুর ছাত্র সেখান থেকে আসত। (খড়দহ-শিবনাথ স্কুল তখন ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত (M.E. School) ছিল। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্— খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী বসন্ত গাঙ্গুলীর পিতা রজনীকান্ত গাঙ্গুলী এই বিদ্যালয়ে ১৯৪১ সাল থেকে আমৃত্যু প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১৯২০ সালে এই বিদ্যালয় থেকেই প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং এম.এ পাশ করার পর এই বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১৯৩০ সালে। ঐ সময়ে ১৯৩০ সালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি পরবর্তীকালে 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি'র (A.B.T.A) প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলেও ১৯০০ সালে প্রথম সুদৃশ্য এবং সুউচ্চ বিদ্যালয় ভবন (প্রায় ২০ ফিট উঁচু একতলা) যা তৈরী হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসের অনুকরণে) শোনা যায় বিদ্যালয় ভবনের জানলা দরজার (৮ ফুট) জন্য ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন থেকে সেগুন কাঠ আনানো হয়েছিল। একশো বছর আগে সেই সময় বিদ্যালয় ভবন তৈরী করতে ত্রাণবাবু ১৪০০০, টাকা খরচ করেছিলেন যা এখনকার হিসাবে ৪০/৫০ লক্ষ টাকার সমান। তখনকার দিনে গঙ্গার তীরে মনোরম পরিবেশে এই সুদৃশ্য বিদ্যালয় ভবন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এতদঞ্চলের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। বাংলার লাট সাহেব লর্ড লিটন বিদ্যালয়ের 'Visitor's Book- এ লিখে গেছেন — One of the finest school building in Bengal. ছাত্রদের ত্রাণনাথ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর বাদে ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ছাত্রীদের জন্য পানিহাটী বালিকা বিদ্যালয়। পানিহাটী মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কিন্তু তখন মহাপ্রাণ ত্রাণনাথ অনন্তলোকে। কে তৈরী করে দেবে বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন? শেষ পর্যন্ত তাঁরই বিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বদান্যতায় বিদ্যলয় ভবনেই প্রাতঃকালে বালিকা বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চলতে লাগল। এইভাবেই কেটে গেল ৪০/৪২ বছর। ১৯৮৮ সালে তৈরী হল পানিহাটী বালিকা বিদ্যালয় ভবন তাঁরই বিদ্যালয়ের প্রদত্ত জমির উপর। বর্তমানে প্রাথমিক বিভাগটি এই বিদ্যালয় গৃহেই প্রাতঃকালিন সময় চলছে। ১৯৯৭ সালে সমগ্র শিক্ষক মন্ডলী ও কার্য্যকরি সমিতির মিলিত প্রচেষ্টায় এই বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কিছুদিন আগে বেগম রোকেয়ার সমাধির কিছু নিদের্শন এখানে পাওয়া গেছে। তার জন্যেই এই বিদ্যালয়ে একটি বেদী নির্মাণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বেগম রোকেয়ার পুরা নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার রংপুরে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মুসলমান মহিলাদের পড়াশুনার অনুমতি ছিল না। যার জন্য তাঁকে তেমন পড়াশুনা করতে দেওয়া হোত না। কিন্তু তিনি পড়াশুনার দিকে খুব আগ্রহী ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯১১ সালে মুসলমান মেয়েদের পড়াশুনার জন্য সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তখনকার

মুসলমান সমাজ এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারেনি। সাখাওয়াতের মৃত্যুর পর তাঁকে কবর দেওয়ার জন্য কোন কবরস্থানে তাঁকে জায়গা দেননি তদানিন্তন মুসলমান সমাজ। তাই তাঁকে পানিহাটীর এই জায়গায় সমাধি দেওয়া হয়।

শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান হিসাবেও ত্রাণনাথ বাবুর অবদান কম নয়। যদিও প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে ত্রাণবাবুর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে এতে আমাদের গর্ববোধ করার কথা। তবুও একথা বলতেই হবে যে ১লা এপ্রিল, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটী প্রতিষ্ঠা হবার পর চেয়ারম্যান হিসাবে কয়েক মাস ছিলেন পানিহাটী জমিদার বাড়ীর প্রথম পুরুষ গৌরীচরণ রায়চৌধুরীর প্রপৌত্র এবং জয়গোপাল রায়চৌধুরীর পৌত্র শিবচন্দ্র রায়চৌধুরী। অবশ্যই ত্রাণবাবু চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করার সঙ্গে সঙ্গেই মিউনিসিপ্যালিটীর কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যায় সেপ্টেম্বর, ১৯০০ সাল। সে সময়ে পানিহাটী এবং নিকটবর্তী অঞ্চল ছিল ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, বসন্ত ও কলেরার আক্রমণে জর্জরিত। চেয়ারম্যান ত্রাণবাবুর পরিচালনায় শুরু হল জঞ্জাল পরিস্কার, শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, নলকূপ খনন, মশার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে সুষ্ঠু জল নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার ধারে ড্রেনের ব্যবস্থা এবং বসন্ত মহামারীর হাত থেকে নাগরিকদের বাঁচানোর জন্য বাড়ী বাড়ী গিয়ে বসন্তের টিকাদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাঁর সময়ে একশো বছর আগে যে মিউনিসিপ্যালিটীর পরিষেবা আরম্ভ হয়েছিল— সেই কর্মকান্ডই আজও চলছে।

সে সময় পানিহাটীর কুন্ডুদের শ্মশান ঘাটের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। গঙ্গার চড়ায় ছিল শ্মশান। জোয়ারের সময় চড়া বা ডাঙ্গাজমি জলে ডুবে যেত, ফলে শ্মশানযাত্রীদের শব নিয়ে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হত। ভাঁটার সময় চড়ায় শবদাহকালীন অবস্থায় হঠাৎ জোয়ার বা বাণ এলে সবাইকে নিরাপদ স্থানে উঠে আসতে হত। শোকাহত আত্মীয়স্বজন বা শ্মশানবন্ধুরা এই কষ্ট অনেকসময়ই সহ্য করতে পারতেন না। বর্ষাকালে দুর্গতি আরো চরমে উঠত। শোকাহত মানুষের এই কষ্ট ও যন্ত্রণা লাঘব করতে সেবাপরায়ণ মহাপ্রাণ ত্রাণনাথ শ্মশানক্ষেত্র নতুনভাবে তৈরী করে দিলেন। মাটি ফেলে নদীর জল বা চড়া থেকে ১৫ ফুট উঁচুতে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে শ্মশানক্ষেত্র নতুনভাবে তৈরী করে দিলেন। গঙ্গার ঘাট, পাকা ঘর ও নির্মাণ হল শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য। মানুষের অশেষ কল্যান সাধিত হল—শুধু পানিহাটীর নয় অনেক দূর দূরান্তের মানুষের। এক সময় পানিহাটীর শ্মশানে আসতেন এবং এখনও আসেন শবদাহের জন্য সুখচর, পানিহাটী, আগরপাড়া, সোদপুর, নাটাগড়, তারাপুকুর, উষুমপুর, ঘোলা, মুড়াগাছা, মধ্যমগ্রাম এমনকি বারাসাত, বসিরহাট অঞ্চল থেকেও। পরবর্তীকালে উন্নত পরিষেবার জন্য পানিহাটী শ্মশানে বসানো হল বৈদ্যুতিক চুল্লী (Electric Crematorium) যা কলকাতার বাইরে প্রথম বৈদ্যুতিক শবদাহ চুল্লী। এই ভাবে মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ত্রাণনাথ মানুষকে ত্রাণ করার কাজে নিজের নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন যথার্থই পানিহাটীর রূপকার।

এই আমাদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদ- যেখানে রয়েছে অসংখ্য দেবালয় ও গঙ্গাস্নানের ঘাট, যেগুলি ক্রমশই ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। পানিহাটী অঞ্চলের এই অসংখ্য গঙ্গার ঘাট সম্বন্ধে বিখ্যাত আইনজ্ঞ, গবেষক ও পন্ডিত লেখক 'যমদত্ত' (যতীন্দ্র মোহন দত্ত) 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় লিখেছিলেন যে এক জায়গায় এত গঙ্গার ঘাট মনে হয় কাশী বা বারানসী ছাড়া আর কোথাও নেই।

পানিহাটীর কথা বলতে গিয়ে গঙ্গার এই ঘাটগুলোকে বাদ দিলে রচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। প্রথমেই বলা যাক এলাকার সব থেকে ব্যস্ত ঘাট, পানিহাটী ত্রাণনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ রাজা রামচাঁদ ঘাট। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত রাস্তাটির নামও রাজা রামচাঁদ ঘাট রোড— যে রাস্তা দিয়ে সোদপুর ষ্টেশন থেকে পানিহাটী ফেরী ঘাট পর্যন্ত অটো চলাচল করে। শ্রী চৈতন্যদেবের অবতরণের সেই বিখ্যাত ঘাট এই ঘাটের পাশেই ছিল। এলাকার সমস্ত প্রতিমা নিরঞ্জনের

ব্যবস্থা এই ঘাটেই করা হয়। বিশাল এই ঘাটটি আনুমানিক ১৮০৮ সালে (প্রায় দুশো বছর আগে) পোস্তার রাজা সুবর্ণবনিক কুলতিলক রাজা রামচাঁদ প্রতিষ্ঠা করেন। ঘাটের উপর সুন্দর চাঁদনি এবং গঙ্গাবাসীর ঘর ছিল। ১৮৯৭ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এই ঘাটের চাঁদনি এবং গঙ্গাবাসীর ঘর ভেঙে যায়। চাঁদনির থামগুলি অনেকদিন খাড়া ছিল এখন তার চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এই ঘাটের পাশে গঙ্গাবাসী ঘরের জায়গায় লঞ্চ ও ষ্টীমার যাতায়াতের জেটী। ঘাটের সামনেই জটিলেশ্বর শিবের মন্দির। এলাকার অপর বিশাল ঘাটটি হল হরিশ চন্দ্র দত্তের বিখ্যাত ঘাট, চাঁদনি এবং দ্বাদশ শিব মন্দির। এই ঘাটের সংলগ্ন রাস্তার নামও হরিশচন্দ্র দত্ত রোড যা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে মিশেছে এবং সুখচর ও পানিহাটীর সীমা নির্দেশ করছে। এই ঘাটের উপরে যে সুরম্য চাঁদনি আছে তা বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার Sir Bradford Leslie- র পরিকল্পনায় তৈরী। এই ঘাটের প্রতিটি ইট বাজুবন্ধ করে কোৎরা চিটে গুড়, চুন ও খদিরের মশলা দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। এই ঘাট ও বারো মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলা ১২১৩ সাল বা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় দুশো বছরের মধ্যে ঘাটের ইটের গাঁথনির মধ্যে কোন ফাঁক দেখা যায় নি। এই ঘাটে চূড়ান্ত ভাঁটার সময়েও লোকে বুক-ভোর জলে ঘাটের পানিচাতালে দাঁড়িয়ে স্নান করতে পারে অথচ অন্যান্য ঘাটে ভাঁটার সময় পানিচাতাল দেখা যায়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা-কর্তৃপক্ষ (Calcutta Port Commissioners) গঙ্গাসাগর সঙ্গম থেকে কালনা পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীর জরীপ করেন। তাঁদের রিপোর্টে বলা হয়েছে — "No other ghat down Kalna is so broad, so massive, so easy of ascent and so beautiful to look at form a distance. It never runs dry even at the lowest ebb-tide." এই বারো মন্দির ঘাটের বেশ কিছুটা দক্ষিণে কয়েকটা ছোট বড় ঘাট পার হয়ে ত্রাণবাবুর প্রশস্ত স্নানের বাঁধাঘাট। বড় সুন্দর চাঁদনি-যুক্ত এই ঘাট। দাক্ষিণাত্যের মাধব বিদ্যারত্ন প্রণীত এক লাল কালিতে হাতে-লেখা পুঁথি দেখিয়া পন্ডিত হারান চন্দ্র স্মৃতিরত্ন এই ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘাটের দক্ষিণেই ত্রাণবাবুর বিখ্যাত ভবানীদেবীর মন্দির ও ঘাট। ত্রাণবাবুর ভবানী মায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরের গায়েই ছাতুবাবুর বাগান ও ঘাট। এই ছাতুবাবু ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত জাহাজ ব্যবসায়ী এবং ধনী রামদুলাল দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষ দেব। এই বাগানে রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার এসেছেন-যা এখন গোবিন্দ কুমার হোম নামে পরিচিত। এই বাগানে একটি গঙ্গার ঘাট এবং পাশে একটি বকুল গাছ আছে। ছাতুবাবু এবং তাঁর পুত্র গিরীশচন্দ্রের শেষকৃত্য এই ঘাটের পাসে বকুলতলায় সম্পন্ন হয়। ছাতুবাবুর মৃত্যুতে কবি ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী 'সংবাদ প্রভাকর' এ লেখেন—"গত মঙ্গলবার রজনী অবসানে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পানিহাটীর উদ্যানের সম্মুখে ভাগিরথী-তীরে মর্তলীলা সম্বরণপূর্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন।" (শনিবারের চিঠি-আষাঢ়, ১৩৫৬)

ছাতুবাবুর বাগান ও ঘাটের দক্ষিণেই জহর সাধুখাঁর ছোট ঘাট এবং পরেই শ্রীমতী গৌরীমনি দাসীর জলের কল ও ঘাট (জলের কল এখন নেই- যেখানে মহুয়া সব পেয়েছি আসর)। এর দক্ষিণেই কলকাতার বিখ্যাত বন্দুক ব্যবসায়ী নন্দলাল দাঁয়ের সোনার জগদ্ধাত্রী মন্দির ও ঘাট। এর পরেই পুরানো পার ঘাট এবং শিশুদের পার্ক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে ঠাকুর বাড়ীতে এসেছিলেন, সেই সেনেদের শ্রীগৌরাঙ্গ ঘাটের পরেই মহোৎসবতলা এবং শ্রী চৈতন্য ঘাট (যা এখন আর নেই) এর দক্ষিণেই বিখ্যাত রাজা রামচাঁদ ঘাট এবং ফেরী জেটী। এর পরের রামনিবাস-এর বাগানে ছোট্ট ঘাটটি নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুটা দক্ষিণে মালাপাড়া ঘাট এবং তার পরেই বিখ্যাত পানিহাটীর বাজার ঘাট যা জয় গোপাল রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত। এর পর চাউলপট্টীর (যা এখন তাঁতপট্টী ঘাট হয়ে গিয়েছে) আমদানী ঘাট এবং শ্মশান ঘাট। এর দক্ষিণে সেই প্রাচীন ঘাট এখন আর নেই শুধু সরু রাস্তাটা চাঁদ দালাল ঘাট রোড নাম বহন করছে। এর পরেই টালিঘাট (বাঁধাঘাট নয়) এবং তারপরেই আর এক বিখ্যাত ঘাট কলকাতার সুবিখ্যাত অ্যাটর্নি নিমাই চাঁদ বসুর পূর্বপুরুষ মদন বসুর ঘাট। এই ঘাটের চাঁদনির উপর ১২৭০

সালের আশ্বিনের ঝড়ে একটা জাহাজ উড়ে আসার ফলে চাঁদনি ভেঙে যায়। এখন আর চাঁদনির কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এরপর একটি ছোট ঘাটের পরেই বিখ্যাত গিরিবালা ঠাকুরবাড়ী ও ঘাট। গিরিবালা ছিলেন কলকাতা জানবাজারের রানী রাসমনির নাতবৌ। অবিকল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনুকরণে (অপেক্ষাকৃত ছোট) শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির ও নাট মন্ডপ ও ছয়টি শিব মন্দির ও বিশাল স্নানের ঘাট (বর্তমানে ঘাটটি বিপজ্জনক ভাবে ভেঙে গেছে) তৈরী করেছিলেন গিরিবালা দাসী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে এই ঠাকুরবাড়ী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমের পরিচালনাধীন।

গিরিবালা ঠাকুর বাড়ীর ঘাটের পরেই বি.এন.ইলিয়াস কোং এর আগড়পাড়া জুট মিলের জেটী ও সাহেব বাগান। পূর্বে সংযোগকারী রাস্তাটির নাম ছিল মিশন রোড (ঊনবিংশ শতাব্দীতে এখানে একটি ইউরোপীয় চার্চ ও মিশনারী স্কুল এবং মিশন ছিল) বি.এন.ইলিয়াস কোং রাস্তাটি পাথর এবং পিচ দিয়ে বাঁধিয়ে দেন, নিজেদের প্রয়োজনে। পরে রাস্তাটির নামকরণ হয় ইলিয়াস রোড। এর পরেই আগরপাড়ার ছাতাপড়া বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর ডুমুরতলা ঘাট এবং পাশেই ভূপেন বসুর বাগানবাড়ী ও ছোট একটি গঙ্গার ঘাট। বর্তমানে এটি আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম এবং মন্দির। এর পরেই পানিহাটী পৌরঞ্চলের শেষ গঙ্গার ঘাট— প্যারী বোষ্টম ঘাট। এই ঘাটের পাশেই ছিল অঘোর সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নৌকা তৈরীর কুটীর শিল্প যার আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ এই শিল্প (অঘোর সম্প্রদায়ের) হুগলীর বলাগড় আর আগরপাড়া ছাড়া আর কোথাও ছিল না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই অঘোর সম্প্রদায়ের বাস থেকে এলাকার নাম আগরপাড়া (অঘোর পাড়া থেকে) হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

পানিহাটী পৌরঞ্চলে গঙ্গার ঘাটের হিসাব করলে দেখা যায় পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর ১ নং ওয়ার্ড সুখচরের ছয়টি এবং ৪ নং ওয়ার্ড আগড়পাড়ার তিনটি ঘাট ধরলে ছোট বড় মোট ঘাটের সংখ্যা তেত্রিশটি যা গবেষক লেখক 'যমদত্তে'র লেখাই সত্য বলে প্রমাণ করে যে কাশী বা বারাণসী ছাড়া গঙ্গার এত ঘাট আর কোথাও নেই।

পানিহাটী পৌর অঞ্চল প্রধানতঃ বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র হলেও সব ধর্মের মানুষই দীর্ঘকাল একত্রে বাস করছে এই জনপদে। তান্ত্রিক, নাথযোগী, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব, হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধারা তৎসহ বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম এমনকি ইউরোপীয় চার্চ ও মিশন এর মানুষেরাও এই অঞ্চলে সমানভাবে নিজেদের মত ও পথ প্রকাশ করে আসছেন। অসংখ্য দেবালয় ছাড়াও এখানে রয়েছে আশ্রম, মঠ ও মসজিদ। অসংখ্য ধর্মীয় আশ্রম যেমন- কাঠিয়া বাবার আশ্রম, ভোলানন্দ গৌড়িয় মঠ, বালক ব্রহ্মচারী আশ্রম, সৎসঙ্গ আশ্রম, কৈবল্য মঠ, ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রম এবং আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমও রয়েছে। ইসলাম সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবেও এক সময় এই অঞ্চলের নাম ছিল— বেশ কয়েকটি মসজিদ যেমন মোল্লাহাট মসজিদ, কারবালা মসজিদ, বি.টি. রোড মসজিদ, বিবি বাগানের মসজিদ, কাজী পাড়ায় মসজিদ-এর এখন আর অস্তিত্ব নেই। তবে তারাপুকুরের 'মানিক পীর' এবং পানিহাটীর ' খোন্‌কা পীরের' আস্তানা এখনও আছে। পানিহাটী যেমন মহাপ্রভুর প্রথম সারির পার্ষদ শ্রীরাঘব পন্ডিতের জন্মস্থান তেমনি আর এক মহাপুরুষেরও জন্মভূমি। তিনি হলেন কলকাতা-বালিগঞ্জের মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর নিত্যগোপাল অবধূত। নবদ্বীপেও তাঁর মঠ আছে। পানিহাটী ঘোষপাড়ায় মামার বাড়ীতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতুলালয়ের জন্মভিটায় পরবর্তীকালে কৈবল্য মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবার আসি পানিহাটী অঞ্চলে শিল্প কারখানার কথায়, প্রথমেই বলি কুটীর শিল্পের কথা। আগরপাড়া অঞ্চলে অঘোর সম্প্রদায়ের নৌকা তৈরী শিল্পের কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্তমানে পানিহাটীর চাউল পট্টী প্রায় তাঁত পট্টীতে পর্যবসিত হয়েছে। কয়েকশো বছর আগে সুখচরে ছিল গুড় ও চিনি তৈরীর শিল্প। অবশ্য সে চিনি ঈষৎ লাল রঙের ছিল। গান্ধীজীর খাদি প্রতিষ্ঠানের কথাও আগেই বলা হয়েছে। খাদি প্রতিষ্ঠানে

বিভিন্ন কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া যেত— যেমন খাদি বা খদ্দরের কাপড় ও চাদর, ঘি, মাখন, মধু, ঘানির সরষের তেল, দেশলাই, কাগজ, ধূপ ইত্যাদি। আগরপাড়া কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত গন্ডার মার্কা গেঞ্জী, হলধর বসু রোডের পানিহাটী শিল্প কুটীরের জামা, প্যান্ট, ইজের প্রভৃতি ছিল খুবই টেঁকসই অথচ দামে সস্তা। নাটাগড়ের কামার পাড়ার তৈরী তালা আলিগড় বা ইংলন্ড, জার্মানীর তালার সমকক্ষ ছিল।

পানিহাটীবাসীর অশেষ সৌভাগ্য যে এই অঞ্চলে পাটশিল্পের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। কারণ পাটকল বা জুটমিল মানেই বস্তি এবং নরককুন্ড, যেমন—কামারহাটী, আলমবাজার, টিটাগড়, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া প্রভৃতি। পানিহাটীর ভারী শিল্পের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয়—১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল। এখানে এসিড, ফিনাইল, আলকাতরা, সাবান এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও ঔষধপত্রের উৎপাদন হয়। এক সময় এই বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানেই ছিলেন খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। কিন্তু পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক থেকেই বেঙ্গল কেমিক্যাল লোকসানে চলতে থাকে। ফলে ১৯৮০ সাল নাগাদ এটি ভারত সরকার অধিগ্রহণ করে। এর পরেই নাম করতে হয় সুরেন্দ্র মোহন বসুর পানিহাটীর বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস। এঁদের ডাকব্যাক নামের বর্ষাতি ও অন্যান্য রবার সরঞ্জাম এবং হাসপাতালের বিভিন্ন দ্রব্যাদি, রেলওয়ে, মিলিটারী, এয়ারফোর্স, নেভী বিদেশেও ডাকব্যকে'র এমনকি তৈরী নানান দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। পানিহাটীর এই শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন দেশের এক গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময়ে পানিহাটীকে বলা হত 'বাংলার ম্যাঞ্চেষ্টার'। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের এখন এমনই দুর্দিন যে একে একে অধিকাংশ কটন মিল বন্ধ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যে বাসন্তী কটন মিল উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৩৪ সালে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন হল সে মিল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। একে একে উঠে গেছে এলাকার বঙ্গোদয় কটন মিল, প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্, বিজয়লক্ষ্মী কটন মিলস্ প্রভৃতি। বঙ্গোদয় কটন মিলের জায়গায় আজ 'পিয়ারলেস নগর' তৈরী হয়েছে। একমাত্র মীনা সিনেমার পোষ্ট অফিসটি বঙ্গোদয় নাম বহন করছে। ডি.এন.চৌধুরী এবং চন্দ্রচূড় চৌধুরীর 'বঙ্গ শ্রী কটন মিল' ও সোদপুর কটন মিল বর্তমানে ভারত সরকারের N.T.C বা National Tobaco Co. খুবই নামকরা কারখানা ছিল কিন্তু শ্রমিক অসোন্তোষে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এলাকার অন্য ডেয়ারীটিও "সরকার ডেয়ারী এন্ড ফার্ম" বন্ধ হয়ে গেছে। ডাকব্যাক কারখানার পূর্বদিকে আগরপাড়া ষ্টেশনের কাছে ছিল এক বিখ্যাত বাঙালী প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর নাম "ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাসট্রীজ লিঃ" সি. কে. সেন এন্ড কোং বিখ্যাত জবাকুসুম তৈল, দীপ্তি হ্যারিকেন, দীপ্তি ইলেকট্রিক ফ্যান ও জনতা স্টোভ ইত্যাদির প্রস্তুতকারক (যাঁদের জিনিসের বাজারে প্রচুর চাহিদা ছিল)। নামকরা এই প্রতিষ্ঠান কেমন করে উঠে যায় তা আমরা বলতে পারি না। তাঁদের কারখানায় জমিও নাকি বিক্রী হয়ে গেছে। পূরণমল জয়পুরিয়াদের 'স্বদেশী ইন্ডাসট্রীজ' একসময় সূতিবস্ত্র ,নাইলন এবং সিন্থেথিক আর্ট সিল্ক তৈরী করত। পরে সেসব বন্ধ হয়ে লোহার রড ইত্যাদি তৈরী হত, যা রোলিং মিলে হয়ে থাকে। অবশ্য ইতিমধ্যে নামও বদল হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ হয়েছে। এলাকার অন্যান্য লোহার কারখানা হল — কোলস ক্রেন — যা পরে ইন্ডিয়ান ক্রেন কোং এবং ট্রাক্টর ইন্ডিয়া লিঃ (এঁদের জিনিস বিদেশেও যায়) বেঙ্গ ল রোলিং মিল, আগড়ওয়াল রোলিং মিল, কাটিয়া ষ্টীল রোলিং মিল, কুসুম ইঞ্জিনিয়ারিং, বেরী ইঞ্জিনিয়ারিং, কমলা আয়রণ, পপুলার আয়রণ ইত্যাদি। অন্যান্য নামকরা কারখানাগুলোর মধ্যে মুরারকা পেন্টস, জনষ্টন পাম্পস্ (ওয়ারদিংটন প্লাম্পস্) হিন্দ ওয়্যার, হিন্দুস্থান ওয়্যাররস্, সোদপুর গ্লাস, গুর্জার গ্লাস, সোদপুর পটারী, সুলেখা ওয়ার্কস ইত্যাদি)। এলাকায় বিড়লাদেরও দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে। Texmaco-Oriental Engineering, Modern India Construction, (Texmaco) যারা রেলওয়ে ওয়াগন তৈরী করে। এই হল সংক্ষেপে পানিহাটী অঞ্চলে শিল্প কারখানার ইতিহাস। এই পৌরাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে

বহুকাল আগে থেকেই। যার ফলে এখানে গড়ে উঠেছে মোট ৩৭টী হাইস্কুল যার মধ্যে ১৭টী বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ২২টী উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এত ছোট এলাকায় একটি স্কুলের গায়ে আর একটি স্কুল দাঁড়িয়ে আছে—যা খুব কম এলাকায় দেখা যায়।

এই আমাদের পানিহাটী যার অতীত কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখবার মত। হাজার বছর আগে যা ছিল গঙ্গাতীরে এক সমৃদ্ধ ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম— যেখানে ছিল মাত্র কয়েকশো মানুষের বাস, যা দেশভাগ এবং স্বাধীনতার পর পঞ্চাশ হাজারের উপর লোকসংখ্যা নিয়ে হয়ে দাঁড়ালো এক শহর। এখনকার পানিহাটী হল এক নগর—যার লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে চার লক্ষ। এই নগরের মধ্যেই রয়েছে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের শিয়ালদহ-রানাঘাট মেন লাইনের দুই ষ্টেশন সোদপুর এবং আগরপাড়া। এই নগরের মধ্য দিয়েই চলে গেছে রাজ্য রাজপথ, দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাস্তা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড এবং সংযোগকারী রাজপথ পানিহাটী-মধ্যমগ্রাম, বারাসাত রোড, যা জাতীয় রাজপথ যশোর রোড (N.H.34) কে রাজ্য রাজপথ -ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে পতিত পাবনী গঙ্গা-ভাগিরথী। এই নগরের মধ্যেই রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল—সুখচর, ভবানীপুর, পানিহাটী, আগরপাড়া, রামচন্দ্রপুর, তারাপুকুর, উযুমপুর, সোদপুর, নাটাগড় ও ঘোলা।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে গঙ্গার ভাঙ্গনে সেই গঙ্গোত্রী-হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সর্বত্রই এক পাড় ভেঙেছে আর এক পাড় গড়েছে এবং বদলে গিয়েছে গঙ্গার দুই তীরের মানচিত্র। গঙ্গার তীরবর্তী হয়েও বদলয়নি শুধু দুটি স্থান— একটি বারাণসী আর একটি পানিহাটী। বারাণসী বা কাশী না হয় শিবঠাকুর— কাশী বিশ্বনাথ এবং মা অন্নপূর্ণার আবাস, কিন্তু পানিহাটী— যেখানে রয়েছে অসংখ্য অবতার, মহামানব ও মণীষীদের পদধূলি, সেই পবিত্র জনপদও এক অক্ষয় জীবনের অধিকারী হয়ে রয়েছে এবং থাকবে।